

জাতিসংঘ ও বাংলাদেশ

মানবাধিকার ছাড়া কোনো মানুষ পূর্ণাঙ্গভাবে বিকশিত হতে পারে না। মানবাধিকার হলো প্রত্যেক মানুষের বেঁচে থাকার জন্য প্রয়োজনীয় কিছু সুযোগ-সুবিধার অধিকার। আমাদের পৃথিবীতে দুটি বড়ো বড়ো যুদ্ধ হয়েছে। এগুলো হলো- প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। দুটি যুদ্ধে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হয়েছে। লাখ লাখ মানুষ যুদ্ধে নিহত হয়েছেন। ১৯১৪ সালে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের ব্যাপকতা এবং ধ্বংসলীলা মানুষকে যুদ্ধের প্রতি বীতশ্রদ্ধ ও শান্তির জন্য আগ্রহী করে তোলে। গঠন করা হয় আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান ‘লীগ অব নেশনস’। প্রতিষ্ঠানটি বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা অর্জনে ব্যর্থ হয়। ১৯৩৯ সালে শুরু হয় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। মানব সভ্যতার ইতিহাসে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের চেয়ে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ছিল আরও কলঙ্কিত ও বিভীষিকাময়। এসময়ে বিশ্বের নেতৃস্থানীয় দেশগুলো একজোট হয়ে বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় জাতিসংঘ গঠন করে। বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠাসহ নারী ও শিশুর অবস্থান উন্নয়নে জাতিসংঘ অনেক ভূমিকা রেখে চলেছে। জাতিসংঘ মানবাধিকার এবং বিশ্বশান্তি রক্ষার জন্য বিভিন্ন দেশে প্রয়োজনে শান্তিরক্ষী বাহিনী প্রেরণ করে। এ অধ্যায়ে আমরা জাতিসংঘ এবং জাতিসংঘে বাংলাদেশের ভূমিকা সম্পর্কে জানব।



এ অধ্যায় শেষে আমরা-

- জাতিসংঘ সৃষ্টির পটভূমি বর্ণনা করতে পারব;
- বাংলাদেশে জাতিসংঘের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণে জাতিসংঘের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে পারব;
- বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় জাতিসংঘে বাংলাদেশের শান্তিরক্ষী বাহিনীর ভূমিকা মূল্যায়ন করতে পারব;
- বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় জাতিসংঘের কার্যক্রমের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হব;
- টেকসই উন্নয়ন অর্জনে অংশীদারিত্বের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করতে পারব;
- টেকসই উন্নয়ন অর্জনে চ্যালেঞ্জসমূহ চিহ্নিত করতে পারব।

জাতিসংঘ সৃষ্টির পটভূমি

যুদ্ধ কখনও জাতিতে জাতিতে সংকট নিরসনের পথ হতে পারে না। যুদ্ধ থেকে আনে ভয়ঙ্কর ধ্বংসলীলা এবং মানবজাতির জন্য অবর্ণনীয় দুর্ভোগ ও অশান্তি। বিশ শতকের ইতিহাসে পৃথিবী জুড়ে দুটি বিশ্বযুদ্ধ ঘটে গেছে। গত শতকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৮) এবং দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ (১৯৩৯-১৯৪৫) সংঘটিত হয়। মূলত জাতিগত দ্বন্দ্ব নিরসনে মধ্যস্থতাকারী শান্তিকামী জনতা যুদ্ধের ধ্বংসলীলায় ছুপ করে থাকেনি। এরই পরিপ্রেক্ষিতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে ১৯২০ সালের ১০ই জানুয়ারি বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে ‘লীগ অব নেশনস’ সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু ‘লীগ অব নেশনস’-এর সাংগঠনিক দুর্বলতা ও অন্যান্য কারণে বিশ্বশান্তি বিধানে তা ব্যর্থ হয়। ১৯৩৯ সালে পুনরায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ধ্বংসলীলা পৃথিবীকে গ্রাস করে। লক্ষ লক্ষ মানুষ নিহত ও আহত হয়। অনেকে গৃহহারা হর ও পঙ্গুত্ব বরণ করে। প্রতিটি দেশ হারায় তাদের কর্মক্ষম যুবসম্প্রদায়কে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভরাবহতা বিশ্ব বিবেককে ভীষণভাবে নাড়া দেয় ও আতঙ্কিত করে তোলে। এ প্রেক্ষাপটে মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট ও ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী উইনস্টন চার্চিলসহ তৎকালীন বিশ্ব নেতৃবৃন্দ শান্তি ও নিরাপত্তা বিধানের জন্য আর একটি নতুন আন্তর্জাতিক সংস্থা গঠনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেন। এরপর ১৯৪৩ সালে তেহরানে ও মস্কোতে সমসাময়িক বিশ্বের ৪টি প্রধান শক্তির একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সম্মেলনে ব্রিটেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া ও ফ্রান্সের প্রতিনিধিবৃন্দ সম্মিলিত জাতিসংঘ

গঠনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। অবশেষে ১৯৪৫ সালের ২৪শে অক্টোবর আনুষ্ঠানিকভাবে জাতিসংঘ আত্মপ্রকাশ করে। এজন্য প্রতি বছর ২৪শে অক্টোবরকে জাতিসংঘ দিবস হিসেবে পালন করা হয়। বিশ্বের স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ জাতিসংঘের সদস্য। ৫০টি সদস্যরাষ্ট্র নিয়ে, জাতিসংঘের যাত্রা শুরু হয়। বর্তমানে (২০২৪ খ্রি:) এর সংখ্যা ১৯৩।

পাঁচটি প্রধান অঙ্গ এবং একটি সেক্রেটারিয়েট নিয়ে জাতিসংঘ গঠিত। পাঁচটি অঙ্গ হচ্ছে: সাধারণ পরিষদ, নিরাপত্তা পরিষদ, অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদ, অছি (তত্ত্বাবধায়ক) পরিষদ এবং আন্তর্জাতিক বিচারালয় বা আদালত। জাতিসংঘের

কাজ
দলগত: জাতিসংঘ সৃষ্টির পটভূমি
বর্ণনা কর।

সকল সদস্য রাষ্ট্র নিয়ে সাধারণ পরিষদ গঠিত। সাধারণ পরিষদকে 'বিতর্ক সভা' বলেও অভিহিত করা যায়। নিরাপত্তা পরিষদ হচ্ছে জাতিসংঘের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও কার্যকরী পরিষদ। ৫টি স্থায়ী ও ১০টি অস্থায়ী মোট ১৫টি সদস্য রাষ্ট্র নিয়ে এটি গঠিত। ৫টি স্থায়ী সদস্য রাষ্ট্র হচ্ছে: মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ফ্রান্স, রাশিয়া ও চীন। এদের প্রত্যেকের 'ভেটো' প্রদান বা কোনো প্রস্তাব নাকচ করে দেওয়ার ক্ষমতা আছে। অস্থায়ী সদস্য রাষ্ট্রসমূহ দুই বছরের জন্য আঞ্চলিক ভিত্তিতে নির্বাচিত হয়। অর্থনৈতিক ও সামাজিক পরিষদের কাজ হচ্ছে অর্থনৈতিক ও সামাজিক সহযোগিতার মাধ্যমে বিশ্বের উন্নয়ন ও অগ্রগতি সাধন করা। স্বাধীনতাপ্রাপ্ত নয়—এরূপ বিশেষ এলাকার তত্ত্বাবধানের জন্য অছি পরিষদ গঠিত। আন্তর্জাতিক বিবাদ মীমাংসা হচ্ছে আন্তর্জাতিক বিচারালয়ের কাজ। নেদারল্যান্ডসের হেগ শহরে এর কার্যালয় অবস্থিত। আন্তর্জাতিক আদালতে ১৫জন বিচারক দায়িত্ব পালন করেন। সেক্রেটারিয়েট হচ্ছে জাতিসংঘের প্রশাসনিক বিভাগ। সেক্রেটারি জেনারেল বা মহাসচিব প্রধান নির্বাহী। আমেরিকার নিউইয়র্ক শহরে জাতিসংঘের সদর দপ্তর অবস্থিত।

জাতিসংঘের সদস্যপদ

জাতিসংঘ চার্টার বা সনদের নিয়মকানুন মেনে চলতে আগ্রহী বিশ্বের যে কোনো শান্তিকামী স্বাধীন দেশ জাতিসংঘের সদস্য হতে পারে। বর্তমানে বিশ্বের ১৯৩টি দেশ জাতিসংঘের সদস্য। বাংলাদেশ ১৯৭৪ সালের ১৭ সেপ্টেম্বর জাতিসংঘের ১৩৬তম সদস্য হিসেবে অন্তর্ভুক্ত হয়। দক্ষিণ সুদান জাতিসংঘের ১৯৩তম সদস্যরাষ্ট্র।

জাতিসংঘের উদ্দেশ্য

জাতিসংঘ সনদে সুস্পষ্টভাবে বিশ্বশান্তি ও সহযোগিতা বিধানের লক্ষ্যে জাতিসংঘের উদ্দেশ্য লিপিবদ্ধ আছে। উদ্দেশ্যসমূহ নিম্নরূপ:

১. শান্তিভঙ্গের হুমকি, আক্রমণাত্মক প্রবণতা ও কার্যকলাপ দূর করে বিশ্বশান্তি ও নিরাপত্তা নিশ্চিত করা;
২. সকল মানুষের সমান অধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শনের মাধ্যমে বিভিন্ন জাতির মধ্যে সহযোগিতা ও বন্ধুত্ব জোরদার করা;
৩. অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে সকল জাতির মধ্যে সহযোগিতা গড়ে তোলা;
৪. জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলের স্বাধীনতা ও মৌলিক অধিকারের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধাবোধ গড়ে তোলা;
৫. আন্তর্জাতিক আইনের সাহায্যে আন্তর্জাতিক বিরোধের শান্তি পূর্ণ সমাধান নিশ্চিত করা;
৬. প্রত্যেক জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকারের স্বীকৃতি ও তা সমুন্নত রাখা, এবং
৭. উদ্দেশ্যসমূহ বাস্তবায়নের জন্য জাতিসংঘের কার্যধারা অনুসরণ করা।

বাংলাদেশে জাতিসংঘের ভূমিকা ও কার্যক্রম

বাংলাদেশে জাতিসংঘের সবক'টি অঙ্গ সংস্থার মিশন আছে। জাতিসংঘের ১৩৬তম সদস্য বাংলাদেশ সবসময়ই এর বিশেষ নজর পেয়ে থাকে। জাতিসংঘের সবক'টি অঙ্গ সংস্থা শুরু থেকেই বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা পরিবর্তনের জন্য কাজ করছে।

এ বিশ্ব সংস্থাটির চারজন মহাসচিব বাংলাদেশে এসেছেন। জাতিসংঘে বাংলাদেশের আর্থিক অবদান কম হলেও বাংলাদেশের সৈন্যরা প্রাণ উৎসর্গ করে শান্তিরক্ষা মিশন পরিচালনায় কার্যকরী ভূমিকা রাখছে। বাংলাদেশ জাতিসংঘের সর্বোচ্চ শান্তি সেনা প্রেরণকারী দেশ। ১৯৮৮ সালে ইরাক ও নামিবিয়া শান্তি মিশনে যোগদানের মাধ্যমে বাংলাদেশ জাতিসংঘের শান্তি মিশন শুরু করে। ছাড়া জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করার পর থেকে বাংলাদেশ এই বিশ্ব সংস্থায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। ১৯৭৫ সালে বাংলাদেশ জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সহ-সভাপতি নির্বাচিত হয়। ১৯৭৯-৮০ এ সময়ের জন্য নিরাপত্তা পরিষদের অস্থায়ী সদস্যপদে বাংলাদেশের নির্বাচন তার এ ভূমিকার স্বীকৃতি এবং বিশ্ব সম্ভ্রদায়ের আশ্বাস স্বাক্ষরবাহী। ১৯৮৪ সাল থেকে জাতিসংঘের কার্যপ্রণালিতে বাংলা ভাষার ব্যবহার আমাদের জন্য খুবই গৌরবের। ১৯৮৬ সালে বাংলাদেশের তৎকালীন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হুমায়ুন রশীদ চৌধুরী জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের ৪১তম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেন। তাঁর এই সভাপতি নির্বাচিত হওয়া বিশ্ব দরবারে বাংলাদেশের বিশেষ ভূমিকার কথাই অরণ করিয়ে দেয়। বিবাদের শান্তি পূর্ণ মীমাংসায় জাতিসংঘ ঘোষিত নীতি অনুসরণ করে বাংলাদেশ ভারতের সঙ্গে গঙ্গার পানিবন্টন বিষয়ক দীর্ঘকালের সমস্যা নিরসনে এবং পার্বত্য চট্টগ্রামের সংঘাতময় পরিস্থিতির সুষ্ঠু সমাধানে অগ্রগতি অর্জন করেছে।

বাংলাদেশে জাতিসংঘের নিম্নোক্ত অঙ্গ সংস্থাগুলো কাজ করছে :

জাতিসংঘ উন্নয়ন কর্মসূচি বা ইউএনডিপি (UNDP) – বাংলাদেশের আর্থিক ও সামাজিক তথা অর্থ-সামাজিক অবস্থার উন্নয়নে ইউএনডিপি দেশব্যাপী অসংখ্য কার্যক্রম চালিয়ে যাচ্ছে। শিশু মৃত্যুহার হ্রাস, মাতৃস্বাস্থ্য উন্নয়ন, দারিদ্র্য হার হ্রাসকরণ এবং নারীর ক্ষমতায়নের ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য সফলতা অর্জন করেছে। বর্তমানে টেকসই উন্নয়নের ১৭টি লক্ষ্যমাত্রা (SDG) অর্জনের লক্ষ্যে কাজ করছে।

জাতিসংঘ শিশু তহবিল বা ইউনিসেফ (UNICEF) – দেশের সুবিধাবঞ্চিত শিশুদের মৌলিক অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে বিশেষত শিক্ষা ও চিকিৎসা নিশ্চিত করার জন্য ইউনিসেফ কাজ করছে।

জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি সংস্থা (UNESCO) – বাংলাদেশের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি উন্নয়নের লক্ষ্যে সংস্থাটি কাজ করছে।

জাতিসংঘের খাদ্য এবং কৃষি সংস্থা বা এফএও (FAO) – বাংলাদেশের বিশাল জনগোষ্ঠীর খাদ্য নিশ্চিত করার জন্য জাতিসংঘের খাদ্য এবং কৃষি সংস্থা কাজ করছে।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বা ডব্লিউএইচও (WHO) – স্বাস্থ্যক্ষেত্রে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বাংলাদেশে বিভিন্ন কর্মসূচি পালন করছে। ২০১৪ সালে বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা বাংলাদেশকে পোলিওমুক্ত হিসেবে ঘোষণা করে।

কাজ

দলপত : জাতিসংঘের ভূমিকায় বাংলাদেশ কীভাবে লাভবান হয়েছে? বিবরণ দাও।

উদাস্তুবিষয়ক জাতিসংঘ হাইকমিশনারের কার্যালয় বা ইউএনএইচসিআর

(UNHCR) – বাংলাদেশ-মিয়ানমার ইস্যুতে এই কার্যালয় মধ্যস্থতা করছে। বিশাল শরণার্থী পালনের খরচেও অবদান রাখছে। তাছাড়া বাংলাদেশে বিহারী জনগোষ্ঠীর আবাসনসহ অন্যান্য ইস্যুতে এই সংস্থা ব্যাপক অবদান রেখেছে।

জাতিসংঘ নারী উন্নয়ন তহবিল বা ইউনিফেম (UNIFEM) – বাংলাদেশে নারীদের উন্নয়নে এ সংস্থাটি বিভিন্ন ধরনের কর্মসূচি পালন করছে। নারীদের বিভিন্ন ধরনের অধিকার আদায়ে ভূমিকা রাখছে এবং অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের সাথে তাদের সংশ্লিষ্ট করছে। নারীদের নিরাপদ শ্রম অভিবাসনসহ বিভিন্ন ইস্যুতেও এ সংস্থা কাজ করে যাচ্ছে।

জাতিসংঘের জনসংখ্যা কার্যক্রম তহবিল (UNFPA) – সংস্থাটি বাংলাদেশের জনসংখ্যা পরিস্থিতি উন্নয়নে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছে।

বাংলাদেশের সার্বিক উন্নয়নে জাতিসংঘের কার্যাবলি খুবই প্রশংসনীয়।

নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য দূরীকরণে জাতিসংঘের ভূমিকা

নারীর প্রতি বৈষম্য দূরীকরণে এবং নারীর অধিকার সংরক্ষণের জন্য জাতিসংঘ তার সৃষ্টিসময় থেকেই বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সনদ ও আইন প্রণয়ন করে। ১৯৪৮ সালে মানবাধিকারের সর্বজনীন ঘোষণাপত্র ছাড়াও জাতিসংঘ নারী উন্নয়নে যেসব কাজ করে তা হলো :

১. ১৯৪৯- মানবপাচার দমন ও পতিতাবৃত্তি অবসানের জন্যে জাতিসংঘ সনদ অনুমোদন।
২. ১৯৫১- আন্তর্জাতিক শ্রম সংস্থা (ILO) কর্তৃক একধরনের কাজের জন্য নারী ও পুরুষ শ্রমিকের একই বেতন প্রদান।
৩. ১৯৫২- নারীর রাজনৈতিক অধিকারের স্বীকৃতি। নির্বাচনে নারী ভোট প্রদান ও প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবে।
৪. ১৯৫৭- বিবাহিত নারী জাতীয়তা সংরক্ষণ বা পরিবর্তন করতে পারবে।
৫. ১৯৬০- নারীদের কর্মসংস্থান ও পেশাক্ষেত্রে বৈষম্য বিলোপ সনদ অনুমোদন।
৬. ১৯৬২- বিয়ের ন্যূনতম বয়স ও রেজিস্ট্রেশন সনদ অনুমোদন।
৭. ১৯৬২- বালিকা ও নারীদের শিক্ষাক্ষেত্রে সমান অধিকার প্রতিষ্ঠা।
৮. ১৯৭৫- নারী বছর ঘোষণা।
৯. ১৯৭৫- প্রথম বিশ্ব নারী সম্মেলন, মেক্সিকোতে অনুষ্ঠিত হয়।
১০. ১৯৭৬-১৯৮৫- নারী দশক ঘোষণা।
১১. ১৯৭৯- নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ, সিডও (CEDAW) নামে অভিহিত। ১৯৮১ সালে এই সনদ কার্যকর হয়।
১২. ১৯৮০- দ্বিতীয় বিশ্ব নারী সম্মেলন ডেনমার্কের রাজধানী কোপেনহেগেনে অনুষ্ঠিত হয়।
১৩. ১৯৮৫- তৃতীয় বিশ্ব নারী সম্মেলন কেনিয়ার রাজধানী নাইরোবিতে অনুষ্ঠিত হয়।
১৪. ১৯৯২- রিও ডি জেনেরোতে পরিবেশ ও উন্নয়ন সম্মেলনে পরিবেশ সংরক্ষণ ও ব্যবস্থাপনায় নারীর ভূমিকার স্বীকৃতি।
১৫. ১৯৯৩- অস্ট্রিয়ার ভিয়েনা সম্মেলনে নারীর অধিকারকে মানবাধিকার হিসেবে স্বীকৃতি দান।
১৬. ১৯৯৫- চতুর্থ বিশ্ব নারী সম্মেলন, বেইজিং। এ বিশ্ব নারী সম্মেলনের ঘোষণা ছিল- 'নারীর চোখে বিশ্ব দেখুন'। এ সম্মেলনে প্রাটফরম ফর অ্যাকশন বা বেইজিং কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করা হয়।
১৭. ২০০০- বেইজিং প্লাস ফাইভ সম্মেলন নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত হয়।
১৮. ২০০৫- বেইজিং প্লাস টেন সম্মেলন নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত হয়।

এভাবে নারীদের কল্যাণে বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রটোকল, সেমিনার ও কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নে জাতিসংঘ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছে।

নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদ বা সিডও ১৯৭৯ (Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women Or CEDAW 1979) :

নারীর প্রতি সকল প্রকার বৈষম্য বিলোপ সনদটি 'সিডও' নামে পরিচিত। ১৯৭৯ সালের ডিসেম্বর মাসে জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে এটি গৃহীত হয়। ১৯৮১ সালে ২০টি দেশ সমর্থন করার পর এটি কার্যকর হয়। বাংলাদেশসহ মোট ১৩২টি দেশ বর্তমানে সনদটি সমর্থন করেছে। এই সনদের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো- এটি নারীর অধিকারের একটি পূর্ণাঙ্গ দলিল। এটি বিভিন্ন সময়ে নারীর প্রতি বৈষম্য নিরসনে গৃহীত বিভিন্ন ইস্যুকে সমন্বিত করে।

কাজ	
দলগত : বিভিন্ন ক্ষেত্রে নারীর প্রতি বৈষম্যের হুক প্রস্তুত কর এবং জাতিসংঘের ভূমিকা চিহ্নিত করে:	
নারীর প্রতি বৈষম্যের ক্ষেত্র	জাতিসংঘের ভূমিকা

নারীর প্রতি বৈষম্য নিরসনে সিডও সনদের ভূমিকা

নারী ও পুরুষের সমতার নীতির ওপর ভিত্তি করে সিডও সনদটি তৈরি। নারীর মানবাধিকারের বিষয়টিও এখানে উঠে এসেছে। আইনগত পদ্ধতিতে এই অধিকারগুলো ম্যাডেটভুক্ত করায় সমর্থনকারী দেশগুলো এই সনদ মেনে চলতে বাধ্য। এই সনদে স্বীকার করা হয় যে, বিভিন্ন দেশে নারীর আইনগত অধিকার বলবৎ থাকলেও বৈষম্য রয়েছে। অর্থনৈতিক ও সামাজিক উন্নয়নে নারীর প্রবেশাধিকার খর্ব করার মাধ্যমে তা করা হয়ে থাকে। এই সনদ নারীর প্রতি রাষ্ট্রের দায়িত্বকে নিশ্চিত করে। সিডও সনদে ৩০টি ধারা আছে। প্রথম ১৬টি ধারা নারীর প্রতি কত প্রকার বৈষম্য আছে তা বিশ্লেষণ করে। আর পরের ১৪টি ধারা ব্যাখ্যা করে এ বৈষম্যগুলো কীভাবে বিলোপ করা যায়।

নারী নির্ধাতন প্রতিরোধে ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদে ২৫শে নভেম্বরকে 'আন্তর্জাতিক নারী নির্ধাতন প্রতিরোধ দিবস' হিসেবে পালনের ঘোষণা দেওয়া হয়। ২৫শে নভেম্বর থেকে ১০ই ডিসেম্বর বিশ্বব্যাপী পালিত হয় নারী নির্ধাতন প্রতিরোধ পক্ষ। জাতিসংঘ ৮ই মার্চকে বিশ্ব নারী দিবস হিসেবে ঘোষণা করেছে। নারীর উন্নয়নের জন্য জাতিসংঘ জন্মলগ্ন থেকে অনেক কাজ করেছে এবং নারীদের অবস্থানকে অনেক উন্নত করেছে।

জাতিসংঘে বাংলাদেশের শান্তিরক্ষী বাহিনীর ভূমিকা

বাংলাদেশ একটি শান্তিপ্ৰিয় দেশ। আর জাতিসংঘ প্রতিষ্ঠা হয়েছে বিশ্বব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে। বৈরিতার অবসান ঘটিয়ে যুদ্ধ বিধ্বস্তদেশে শান্তি স্থাপনের জন্য কাজ করে যাচ্ছে জাতিসংঘের শান্তিরক্ষা মিশন। জাতিসংঘের এই শান্তিরক্ষা মিশনগুলোতে বাংলাদেশের অবদান ঈর্ষণীয়। ১৯৮৮ সাল থেকে শুরু করে ২০২৪ সাল পর্যন্ত ৪০ টি দেশে/অবস্থানে জাতিসংঘের ৬৩টি শান্তি মিশনে বাংলাদেশের প্রায় ১ লক্ষ ৯৪ হাজার ৮৫৬ জন শান্তিরক্ষী কাজ করেছে।

বর্তমানে সেন্ট্রাল আফ্রিকান রিপাবলিক, মালি, দক্ষিণ সুদান, লেবানন, ডি আর কঙ্গো, ওয়েস্টার্ন সাহারা ও আবেই (সুদান) প্রভৃতি দেশে জাতিসংঘ পরিচালিত শান্তি মিশনে কাজ করেছে বাংলাদেশের শান্তিরক্ষীরা। জাতিসংঘ মিশনে দায়িত্ব পালনকারী বাংলাদেশের শান্তিরক্ষীর সংখ্যা বর্তমানে বিশ্বের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ।

আফ্রিকার দেশগুলোতে বাংলাদেশ সৈন্যদের অভূতপূর্ব সাফল্য সারা বিশ্বে বাংলাদেশের গ্রহণযোগ্যতাকে অনেক বৃদ্ধি করেছে। বিশ্বব্যাপী শান্তি প্রতিষ্ঠার মডেল হিসেবে এবং শান্তিপ্ৰিয় জাতি হিসেবে বাংলাদেশ পরিচিতি পেয়েছে।

আফ্রিকা এবং এশিয়ার বিভিন্ন দেশে রাজনৈতিক পক্ষপাতিত্বের কারণে অন্যান্য দেশের সৈন্যরা যেখানে গ্রহণযোগ্যতা পাচ্ছিল না সেখানে বাংলাদেশি সৈন্যরা শুধু গ্রহণযোগ্যতা নয়, পেয়েছে স্থানীয় মানুষের ভালোবাসা, শ্রদ্ধা। সিয়েরা লিওনে বাংলা ভাষা পেয়েছে সেই দেশের দ্বিতীয় রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা। আইভরিকোস্টে অন্যতম ব্যস্ত সড়কের নাম হয়েছে 'বাংলাদেশ সড়ক'। এই দেশটিতে একটি গ্রামের নাম রাখা হয়েছে 'রুপসি বাংলা'।

শান্তিমিশনে শুধু বাংলাদেশ সেনাবাহিনী নয়, পাশাপাশি পুলিশ বাহিনী ও মহিলা পুলিশও নিয়োজিত আছেন। তাদের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলে জাতিসংঘে তথা বিশ্বে বাংলাদেশ পেয়েছে ব্যাপক পরিচিতি ও বিশেষ মর্যাদা।

জাতিসংঘের শান্তিরক্ষার মিশন সহজ ছিল না। আফ্রিকা ও এশিয়ার দেশগুলোতে যুদ্ধবন্দেহী দুই বা ততোধিক সশস্ত্র পেরিলাগোষ্ঠীর মাঝে দাঁড়িয়ে বাংলাদেশি সৈন্যরা অত্যন্ত দক্ষতার সাথে অস্ত্র বিরতি পর্যবেক্ষণ করেছে। শান্তি প্রতিষ্ঠার কাজ করেছে। এ কাজে এখন পর্যন্ত ১৬৭ জন বাংলাদেশি সৈন্য বিশ্ব শান্তির জন্য শহিদ হয়েছেন। আহত হয়েছে অনেকে। বাংলাদেশি সৈন্যরা প্রমাণ করেছে শান্তির জন্য তারা জীবন দিতে প্রস্তুত।

বাংলাদেশ মধ্যম আয়ের দেশের পথে, অধিকতর এর আছে বিশাল জনগোষ্ঠী। বিশাল জনগোষ্ঠীর প্রশিক্ষিত সামরিক-বেসামরিক বাহিনী বিশ্ব শান্তিরক্ষার জন্য জাতিসংঘের মাধ্যমে অবদান রাখছে। উন্নত দেশগুলো অর্থ দিয়ে জাতিসংঘে অবদান রাখছে। বাংলাদেশ তার সেনাবাহিনী ও পুলিশ বাহিনীর মাধ্যমে বিশ্বশান্তি রক্ষার রেখেছে এক অনন্য অবদান; বৃদ্ধি করেছে দেশের মর্যাদা ও গৌরব।

কাজ
একক : জাতিসংঘে বাংলাদেশের
শান্তিরক্ষী বাহিনীর ভূমিকার
ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিত কর।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (SDGs)

আন্তর্জাতিক সংস্থা জাতিসংঘ গঠিত হওয়ার পর থেকে এর উদ্দেশ্যগুলো অর্জনে সংস্থাটি অনেক সাফল্য লাভ করেছে। ক্ষুধা ও দারিদ্র্যমুক্ত হয়ে সকলের সম্ভাবনা, মর্যাদা ও সমতা নিশ্চিত করতে জাতিসংঘ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। তাই অর্থনৈতিক, সামাজিক ও পরিবেশ উন্নয়নের সমন্বয়ে 'টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট' (এসডিজি) অর্জনে জাতিসংঘ কাজ করে যাচ্ছে। জাতিসংঘ নির্ধারিত এসডিজি অর্জনে বিশ্বের অন্যান্য দেশের সাথে সাথে বাংলাদেশও সমান তালে কাজ করে যাচ্ছে।



টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে অংশীদারিত্বের গুরুত্ব

এসডিজি অর্জনে অংশীদারিত্বের গুরুত্ব ব্যাখ্যা করার পূর্বে আমাদের জানা দরকার অংশীদারিত্ব কী? যেকোনো সামাজিক ব্যবস্থার সুফল ভোগকারী গোষ্ঠীই হলো অংশীজন। অংশীজনদের কিছু দায়িত্ব ও কর্তব্য থাকে। সেই দায়িত্ব ও কর্তব্য ঠিকমতো পালন করলে অংশীদারিত্ব প্রতিষ্ঠিত হয়। যেমন ধরা যাক, ভালো ফসল ফলানোর জন্য সরকার সার ও প্রয়োজনীয় কীটনাশক সরবরাহ করবে। কিন্তু যারা এটি ব্যবহার করবে তারা যদি অসচেতনভাবে মাত্রার অতিরিক্ত ব্যবহার করে তা কখনো পরিবেশবান্ধব হবে না। এক্ষেত্রে তাদের দায়িত্ব হচ্ছে সচেতনতার সাথে পরিমিত সার ও কীটনাশক ব্যবহার করা। কেবল ব্যক্তিক লাভের কথা চিন্তা না করে সামষ্টিক উপকারিতা কীভাবে আসবে সেটি চিন্তা করে কাজ করাটা হলো এক ধরনের অংশীদারিত্ব। যে কোনো উন্নয়ন কর্মকাণ্ডই পরিচালিত হোক না কেন তা যেন সকলের কথা ভেবে হয়।



এসডিজি অর্জনে সমাজের সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের কথা যেমন চিন্তা করা হচ্ছে, তেমনি সমাজ ও রাষ্ট্রের নিয়ন্ত্রক বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানসমূহের অংশীদারিত্বকে নিশ্চিত করে কাজ করতে হবে।

তবে সব অভীষ্ট সবার জন্য সমানভাবে প্রযোজ্য নাও হতে পারে। যে দেশের জন্য যেসব অভীষ্ট অর্জন জরুরি তারা সেগুলোকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে বাস্তবায়ন করবে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রে একটি বিশেষ দিক হচ্ছে সার্বিক সক্ষমতা অর্জন। টেকসই উন্নয়নের প্রধান একটি অভীষ্ট হচ্ছে আন্তর্জাতিক সহযোগিতা গড়ে তোলা। এক্ষেত্রে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সহযোগিতা পারস্পরিক অংশীদারিত্বের সূচনা করে। যে দেশের যে ধরনের সক্ষমতা রয়েছে সে দেশ সেভাবে নিজেদের ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে সামষ্টিক উন্নয়ন লক্ষ্যসমূহ অর্জনে এগিয়ে আসবে। কাউকে পিছিয়ে রেখে অন্যরা এগিয়ে গেলে সেই উন্নয়ন জাতীয় ও বৈশ্বিকভাবে টেকসই হবে না।

কাজ: টেকসই উন্নয়নে অংশীদারিত্ব কেন প্রয়োজন আলোচনা করে লিখ।

টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট অর্জনে বাংলাদেশের চ্যালেঞ্জ

বর্তমানে পৃথিবীব্যাপী যে উন্নয়ন ঘটেছে তা ভারসাম্যহীন। এই উন্নয়ন হচ্ছে দেশে দেশে এবং মানুষে-মানুষে বিভেদ সৃষ্টিকারী, বিভেদ বর্ধনকারী উন্নয়ন। এই প্রকট ও ক্রমবর্ধমান বৈষম্য ও বিভক্তি টেকসই উন্নয়নের পথে একটি বড় চ্যালেঞ্জ। বাংলাদেশও এই চ্যালেঞ্জের বাইরে নয়। যদিও বাংলাদেশে সাম্প্রতিক সময়ে দারিদ্র্য ও অতিদারিদ্র্য উল্লেখযোগ্যভাবে কমেছে। তবে একটি বিশেষ লক্ষণীয় দিক হলো আয় ও ভোগ বৈষম্য। আমাদের সম্পদ বৈষম্য ক্রমাগত বেড়ে চলেছে। সমাজে এক শ্রেণির মানুষ ভূমিদখল, নদীদখল, বন

দখল এমনকি অর্থনৈতিক প্রতিষ্ঠান কৃষ্ণিগত করে অপরিমিত সম্পদশালী হয়েছে। এর ফলে ভারসাম্যহীন সমাজ গড়ে উঠছে ও পরিবেশের ক্ষতি হচ্ছে। বিশ্বব্যাপী উন্নয়নের অব্যাহত যাত্রা এবং অনিয়ন্ত্রিত জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহারের ফলে জলবায়ু পরিবর্তনে বিরূপ প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা যাচ্ছে। ব্যক্তিপর্যায় থেকে সামষ্টিক পর্যায়-সর্বত্র জবাবদিহিতা ও স্বচ্ছতার অভাব টেকসই উন্নয়নের পথে চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াচ্ছে।

পাবলিক ও প্রাইভেট প্রতিষ্ঠানের মধ্যে সমন্বয়হীনতা এবং অংশীদারিত্ব না থাকলে টেকসই উন্নয়ন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি হবে। শুধু সম্পদ বৈষম্যই নয়, আয়, ভোগ, জেভার এবং অঞ্চল বৈষম্যও কখনো কখনো টেকসই উন্নয়নে চ্যালেঞ্জ হয়ে দাঁড়াবে। অপরিকল্পিত শিল্পায়ন ও নগরায়ণের ফলে সৃষ্ট সমস্যা টেকসই উন্নয়নের পথে বড়ো ধরনের চ্যালেঞ্জ হিসেবে কাজ করবে। সামাজিক বিপর্যয়ের পাশাপাশি প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলা করার প্রয়োজনীয় প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা না থাকা-উন্নয়নের গতিকে পথরোধ করবে। প্রয়োজনীয় অবকাঠামোগত দুর্বলতা, গ্যাস, তেল, বিদ্যুৎ ঘাটতি ও কৃষিপণ্য সুষ্ঠু বাজারজাতকরণের অব্যবস্থা প্রভৃতি কারণে এসডিজি অর্জন বেশ কঠিন হবে বলে ধারণা করা যায়।

অনুশীলনী

সংক্ষিপ্ত উত্তর প্রশ্ন

১. সিয়েরা লিওনে বাংলা ভাষা দ্বিতীয় রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা পেয়েছে কেন?
২. ভেটো কী?

বর্ণনামূলক প্রশ্ন

১. জাতিসংঘ সৃষ্টির প্রেক্ষাপট ব্যাখ্যা কর।।
২. বিশ্বশান্তি প্রতিষ্ঠায় বাংলাদেশের অবদান মূল্যায়ন কর।

বহুনির্বাচনি প্রশ্ন

১. বাংলাদেশ কত সালে জাতিসংঘের সদস্যপদ লাভ করে?
ক. ১৯৭৪
খ. ১৯৮০
গ. ১৯৮৪
ঘ. ১৯৮৬

নিচের অনুচ্ছেদটি পড় এবং ২ ও ৩ নম্বর প্রশ্নের উত্তর দাও

তাপস রায় আফ্রিকার একটি অঞ্চল থেকে তার স্ত্রীকে জানান, সেখানে যুদ্ধরত দলগুলোর মধ্যে যুদ্ধবিরতি ঘটাতে তাদের উদ্দেশ্য সফল হয়েছে এবং তারা সকল শ্রমিকের আস্থা অর্জনে সক্ষম হয়েছেন।

২. তাপস রায় দেশের পক্ষে যে কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করছেন তা হলো—

- i. জাতিসংঘ মিশন
- ii. শান্তিরক্ষা মিশন
- iii. বাংলাদেশ মিশন

নিচের কোনটি সঠিক ?

- ক. i ও ii
- খ. i ও iii
- গ. ii ও iii
- ঘ. i, ii ও iii

৩. উক্ত কার্যক্রমে বহির্বিশ্বে বাংলাদেশের কী অর্জন হয়েছে?

- ক. বিশ্বশান্তি
- খ. সুশৃঙ্খল বাহিনী গঠন
- গ. বহির্বিশ্বে প্রভাব বিস্তার
- ঘ. শক্তি বৃদ্ধিতে উন্নত কৌশল

সৃজনশীল প্রশ্ন

১. গৃহবধূ রিতা উচ্চশিক্ষিত হওয়া সত্ত্বেও পরিবারের পক্ষ থেকে তাকে কোনো কর্মক্ষেত্রে যোগদানের অনুমতি দেওয়া হয়নি। অনেক যুক্তি ও সংগ্রামের পরে তিনি একটি প্রাইভেট ফার্মে চাকরি লাভ করেন। সেখানে একই পদমর্যাদা ও দক্ষতার পুরুষ সহকর্মী অপেক্ষা তাকে কম আর্থিক সুবিধাদি দেওয়া হয়। একপর্যায়ে যথাযোগ্য সম্মান ও প্রাপ্য সুবিধা নিশ্চিত করার জন্য তিনি কর্তৃপক্ষের সাথে আলোচনা করেন; অবশেষে সফলও হন। সিয়েরা লিওনে কর্মরত বাংলাদেশ পুলিশের সদস্য রিতার ভাই লাভলু এ সংবাদ জেনে অত্যন্ত খুশি হন এবং তিনি বোনকে অভিনন্দন জানান।

ক. 'লীগ অব নেশনস' কত সালে প্রতিষ্ঠিত হয়?

খ. জাতিসংঘের বিতর্ক সভা বলতে কী বোঝায়?

গ. রিতার মতো নারীর অধিকার আদায়ে জাতিসংঘের কোন অঙ্গ সংস্থা কাজ করছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. রিতার ভাই লাভলু দেশের জন্য গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে অবদান রেখে চলেছেন— তোমার উত্তরের সপক্ষে যুক্তি দেখাও।

২.

দৃশ্যকল্প-১	একটি রিয়েল এস্টেট প্রতিষ্ঠান বালু নদীর কিছু অংশ ভরাট করে পাশের কিছু জমিসহ সাইনবোর্ড টানিয়ে প্লট বিক্রি করছে।
দৃশ্যকল্প-২	সভারে ট্যানারি শিল্প স্থাপনের পর বর্জ্য ব্যবস্থাপনা না করে পার্শ্ববর্তী খালে বর্জ্য ফেলা হচ্ছে।
দৃশ্যকল্প-৩	'ক' সিটি কর্পোরেশনের নাগরিকগণ সরকারের দিকে তাকিয়ে না থেকে সকলে তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালন করার মাধ্যমে সেটিকে সুন্দর বাসযোগ্য কর্পোরেশনে রূপান্তর করেছে।

ক. জলবায়ু কার্যক্রম কী?

খ. টেকসই উন্নয়নে অংশীদারিত্ব কেন প্রয়োজন?

গ. দৃশ্যকল্প ১ ও ২ কোন বিষয়কে নির্দেশ করছে? ব্যাখ্যা কর।

ঘ. দৃশ্যকল্প-৩ বিশ্বের সর্বত্র সার্বিক ও সর্বজনীন কল্যাণ নিশ্চিতের উদাহরণ—মূল্যায়ন কর।